Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Page No. 46-50
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ত্রিপুরায় পরিবহন সংস্কৃতি ও যাতায়াত ব্যবস্থা

রিন্টু দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Generally we search 'Culture' in Literature, Music and Fine Arts. But the word 'Culture' has a broader meaning. To understand the culture of a particular society, we need to find out the social rituals, practical ingredients of life in the midst of thoughts and human resources. Culture is deeply related with the livings and the practices of daily life. Transport and transportation is a necessary part of socio-cultural life of people. The cultural flow of Tripura is sustained from ancient period to till now. Transport and transportation system is also changing gradually in this context. To search the history and evolution of transportation in Tripura is the main focus of this research article.

Key words: Culture, Transport, Transportation, Tripura, History, Evolution.

'সংস্কৃতি'কে সাধারণত আমরা সাহিত্য, সংগীত ও ললিতকলায় অনুসন্ধান করে থাকি। কিন্তু 'সংস্কৃতি' শব্দটির আরো বৃহত্তর অর্থ রয়েছে। কোনো সুনির্দিষ্ট সমাজের সংস্কৃতিকে জানতে হলে সামাজিক রীতি-নীতি, জীবনধারণের বাস্তব উপকরণ এবং ভাব ও মানবসম্পদের মধ্যে তাকে সন্ধান করতে হবে। সংস্কৃতি মানুষের জীবন-যাপন ও জীবনচর্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাও মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রাচীন যুগ থেকে ত্রিপুরায় সংস্কৃতির যে ধারা অব্যাহত রয়েছে তারই অঙ্গ হিসাবে পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়েছে। ত্রিপুরায় রাজন্য আমলে যাতায়াত ব্যবস্থা তেমন সুগম ছিল না। স্থলপথে হাতি, ঘোড়া, মাচা এবং জলপথে ভেলা, নৌকা ও স্টিমার ছিল যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম। সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটেই স্থানান্তরে গমন করতেন। বিশ শতকের শুরুর দিকে পরিবহণ ব্যবস্থার সূচনা হয়। ত্রিপুরায় পরিবহণ সংস্কৃতি ও যাতায়াত ব্যবস্থার ইতিহাস এবং বিবর্তনের অনুসন্ধান ও সত্য উদ্ঘাটনই এই গবেষণাপত্রের মূল অন্বিষ্ট।

রাজন্য আমলে ত্রিপুরায় রাস্তাঘাট ছিল না বললেই চলে। সাধারণ প্রজারা দূরের কথা, রাজা বা রাজপ্রতিনিধিরাও যাতায়াতের সময় অত্যন্ত সমস্যার সম্মুখীন হতেন। দীনেশ চন্দ্র সাহা তাঁর 'বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরা' (১ম খন্ড— রাজন্য যুগ) গ্রন্থে জানিয়েছেন,

> *"রাজা বা রাজপ্রতিনিধি বিভাগ পরিদর্শনে যেতে হলে একমাস আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে তৈতুন প্রথায় বেগার-খাটা প্রজাদের সাহায্যে জঙ্গল কেটে হাতি চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা তৈরী করা হতো।"*[১]

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সামরিক প্রয়োজনে রাস্তাঘাট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার আগে ত্রিপুরার যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।

আসামের রাজা রুদ্র সিংহ ত্রিপুরা দেশে রত্ন কন্দলী শর্মা ও অর্জুন দাস বৈরাগী নামে দুজন দূত প্রেরণ করেছিলেন। ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে এই দুজন অসমিয়া ভাষায় 'ত্রিপুরা বুরঞ্জী' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থে তাঁদের নিজের চোখে দেখা ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৫ সালে ত্রিপুর চন্দ্র সেন লন্ডন শহরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত সেই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে 'ত্রিপুরা দেশের কথা'(১৬২৬-১৭১৫ খ্রি.) নাম দিয়ে বাংলা ভাষায় গ্রন্থটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিতে ত্রিপুরার রাজা রত্নমানিক্যের সময়কাল বর্ণিত হয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরার যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থ থেকে। রত্ন কন্দলি ও অর্জুন দাস আসাম থেকে ত্রিপুরা আসার জন্য যে সব যানবাহনে সওয়ার হয়েছিলেন তা তাঁদের বর্ণনা থেকেই উদ্ধার করা যেতে পারে :

ক) "কার্ত্তিক মাসের তিন দিন থাকিতে এক সোমবারে ত্রিপুরার দূতগণের সহিত আমরা ত্রিপুরা দেশ অভিমুখে রওনা হইলাম। আমাদের তটীয়া-পাড়ার বাসা হইতে নামডাঙ্গায় গিয়া নৌকায় উঠিয়া আমরা সাত দিনে রহায় পৌঁছিলাম।" (পৃ. ২৩)

খ) "ত্রিপুরার দূতগণকে এবং আমাদের দুইজনকে মাচায় তুলিয়া বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য লোক দিল।" (পৃ. ২৫)

গ) "সেখানে দেওগাং নামে একটি নদী আছে। ঐ নদীতে বাঁশের ভেলা বাঁধিয়া তাহাতে উঠিয়া আমরা ভাটীতে নামিয়া আসিলাম...।" (পৃ. ২৬—২৭)

ঘ) "পরদিন আমরা দুই দূতের জন্য দুই ঘোড়া এবং উদয়নারায়ণের জন্য এক ঘোড়া মোট তিনটি ঘোড়া পাঠাইলেন...।" (পৃ. ২৮)

দেখা যাচ্ছে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরায় যাতায়াতের জন্য নৌকা, মাচা, বাঁশের ভেলা, ঘোড়া প্রভৃতি ব্যবহৃত হতো। এছাড়া রাজা-মহারাজারা হাতির পিঠেও যাতায়াত করতেন। উনবিংশ শতাব্দীতেও যাতায়াত ব্যবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল তাঁর 'ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে জানাচ্ছেন,

> *"পার্বত্য ত্রিপুরার অভ্যন্তর ভাগে যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না, এমন কি, এই শতকের (বিশ শতকের) তৃতীয় দশকেও। একমাত্র পায়ে-হাঁটা পথই ছিল সম্বল,—তাও খুব অভ্যন্তর ভাগে নয়। আর সম্বল ছিল জলপথ,— পায়ে হেঁটে বা নৌকায়। মহারাজারা বা পদস্থ রাজকর্মচারীরা যাতায়াত করতেন হয় হাতীর পিঠে চড়ে, নয়তো নৌকায়।"*[২]

ত্রিপুরার বিভাগীয় শহর অর্থাৎ মহকুমা শহরে যাতায়াত করার জন্য ব্রিটিশ ভারতের উপর দিয়ে চলা আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের সাহায্য নিতে হতো। আসাম-বেঙ্গল রেলের কাজ ১৮৯২ সালে শুরু হয়েছিল। ১৮৯৯ সালে প্রথম শিলচর পর্যন্ত রেল চলাচল করে। ত্রিপুরায় রেল পরিষেবা চালু হতে তখনো অনেক দেরি।

বিশ শতকের গোড়ায় গরুর গাড়ি ও ঘোড়ার গাড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মোটরযান চলাচলের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের এক রাজ-আদেশে। সেই আদেশে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মোটরগাড়ির লাইসেন্সের কথা বলা আছে। তবে মহারাজা ও উচ্চপদস্থ কর্তা-ব্যক্তিদের প্রাইভেট গাড়ি তার আগেও ছিল। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরায় পরিবহন শিল্প গড়ে ওঠে। ত্রিপুরার প্রথম মোটর পরিবহন সংস্থা আগরতলা থেকে আখাওড়া যাতায়াত করত। রাস্তার দূরত্ব ছিল ছয় মাইল। এই পরিবহন সংস্থার নাম পাওয়া যায় না। ১৯৩৮ সালে দেড় লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে 'Agartala Motor Transport Company' (AMTC) নামে একটি যৌথ মালিকানাধীন সংস্থা পরিবহণ ব্যবসা শুরু করে। এর পরে আরো যে দুটি সংস্থা আগরতলা থেকে আখাওরা রাস্তায় তাদের পরিষেবা চালু করেছিল তারা হলো C.M.T.C ও N.M.T.S। এদের মধ্যে N.M.T.S দেশভাগের পর চালু হয়। এই সব সংস্থার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মালিকানা ছিল রাজবাড়ির কর্তা-ব্যক্তিদের হাতে। ১৯৪৬ সালে এম.বি.বি কলেজ খোলার

আগে 'কলেজ ট্রান্সপোর্ট'-এর প্রয়োজনে তৈরি হয়েছিল 'The Tripura Automobile Syndicate'। তবে মোটর পরিষেবা মূলত ছিল শহর কেন্দ্রিক। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে সত্তর-আশির দশকেও ত্রিপুরার সাধারণ প্রান্তিক মানুষেরা মোটরগাড়ি চড়ার কথা ভাবতেই পারত না। যাত্রী পরিবহনকারী সরকারী বাসকে তারা 'মুড়ির টিন' বলত। এই 'মুড়ির টিন' দেখার জন্য মানুষ ভিড় জমাতো। ঢাকাতে অনেক আগে থেকেই বাসকে 'মুড়ির টিন' বলার চল ছিল। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত 'ত্রিপুরা : সেকাল—একাল' গ্রন্থে ত্রিপুরার ফটিকরায়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে বিভাস কিলকিদার লিখেছেন,

> *"সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা। সাধারণতঃ কোন যানবাহন এখানে আসে না, তবে নির্বাচনের প্রাক্কালে মাঝে মাঝে দু'একটি জীপ গাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়। এছাড়া কদাচিৎ সরকারী গাড়ী অথবা কোন কোন ব্যবসায়ী গাড়ী দেখা যায়। এখনও ফটিকরায়ের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে একটা ভাঙ্গা জীপ-গাড়ী দর্শনীয় বস্তু।"*[৩]

ত্রিপুরায় রিক্সা চলাচল শুরু হয় ১৯৪০-৪১ সালে। ১৯৩৯ সালে ঢাকা রায়পুরা প্রভৃতি অঞ্চলে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা জানা যায়। এই দাঙ্গায় কিছু হিন্দু উদ্বাস্তু আগরতলায় এসে হাজির হয়। তাদের আত্মীয়-স্বজন আগে থেকেই এখানে চাকরি অথবা ব্যবসার প্রয়োজনে বসবাস করছিল। সরকারের আদেশে এই সদ্য আগত উদ্বাস্তু যারা এই রাজ্যে বসবাস করতে ইচ্ছুক তাদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়। রায়পুরা দাঙ্গায় উদ্বাস্তু হয়ে যারা এসেছে তাদের মধ্যে ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক যেমন ছিল তেমনি কিছু রিক্সা-চালক ও রিক্সা-মালিকও এসেছিল। এদেশে এসে ওই রিক্সা-চালকরা তাদের পুরনো পেশাকেই বেছে নেয়। এদের আগমনের আগে আগরতলা শহরে কোনো রিক্সা ছিল না। রিক্সা চালাতে এসে রিক্সা চালকরা প্রথম পেশাগত সংঘর্ষের সম্মুখীন হয় ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের সঙ্গে। এই সংঘর্ষে পুলিশ সবসময় গাড়োয়ানদের পক্ষ অবলম্বন করতো। এছাড়া রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা অনেকসময় রিক্সায় উঠলেও ভাড়া দিতে চাইতেন না। সেই সঙ্গে ছিল মালিকদের জুলুম। এই জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কিছু রিক্সা-চালকের উদ্যোগে রিক্সা মজদুর ইউনিয়ন তৈরি হয়।

শুধু রিক্সা মজদুর ইউনিয়ন নয়, শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দে মনোহর বিশ্বাস, আজমল দাস, গিরিজা চক্রবর্তী প্রমুখের চেষ্টায় এবং শ্রমিকদের উৎসাহে 'Tripura Motor Works Association' গড়ে উঠেছিল। পরে এই সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন উপেন্দ্র বণিক, বিদ্যাধর, ত্রিপুর সেন প্রমুখ। সেইসময়ে রাজমন্ত্রীর প্রস্তাব মতে আখাওড়া থেকে আগরতলা রাস্তায় সমস্ত প্রাইভেট ও ভাড়া করা মোটর বাস, লরি, ট্যাক্সি প্রভৃতিকে প্রতিবারের যাতায়াতে চার আনা এবং বেসরকারি ঘোড়ার গাড়িগুলিকে এক আনা ছয় পাই হিসাবে ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মোটরগাড়ি ও ঘোড়ার গাড়ির মালিকেরা এই ট্যাক্স ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারেননি। কারণ লাইসেন্স ফি, রোড ট্যাক্স দেওয়ার পরেও এই বাড়তি ট্যাক্স তাঁদের কাছে জুলুম বলে মনে হয়েছিল। এদিকে ১৯৩৮ সালের শেষদিকে রাজ-আদেশে Agartala Motor Transport Company (AMTC)-কে বাৎসরিক আট থেকে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে আখাওড়া থেকে আগরতলা রাস্তায় গাড়ি চলাচল ও যাত্রী পরিবহনের মনোপলি প্রদান করা হয়। সেইসময় আর একটি মনোপলি কুমিল্লার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এক আইরিশ কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছিল। এই কোম্পানি মোটরগাড়ি ছাড়া লঞ্চ পরিষেবাও প্রদান করত। ত্রিপুরায় কুমিল্লা থেকে উদয়পুর পর্যন্ত 'গোমতী লঞ্চ' পরিষেবা চালু ছিল।

মাল পরিবহনও সেইসময় অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। আগরতলায় জিনিসপত্র আসত আখাওড়া থেকে মোটরে বা নৌকায় পাশের খাল দিয়ে অথবা মোগড়া থেকে হাওড়া নদী হয়ে। জিরানিয়া ও চম্পকনগর পর্যন্ত এই পথেই মাল বহন করা হতো। অন্যান্য বিভাগ বা মহকুমার মাল নেওয়া হতো ব্রিটিশ-ভারতের সংশ্লিষ্ট রেলস্টেশন থেকে গরুর গাড়িতে বা নৌকায়। কখনও আবার ঘোড়ার ব্যবস্থাও থাকতো। চা-বাগান সংশ্লিষ্ট এলাকায় অনেক সময় ট্রলি করেও মাল বহন করা হতো। তবে মাল পরিবহনের প্রধান বাহন ছিল নৌকা।

ত্রিপুরায় প্রথম বিমানঘাটি স্থাপিত হয় ১৯৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে সিঙ্গারবিলে এটি নির্মিত হয়েছিল। এই নির্মাণে অর্থ যোগান দিয়েছিল ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী। এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তৎকালীন মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর। ঘাটিটি 'সিঙ্গারবিল বিমানঘাঁটি' নামে পরিচিত ছিল। তবে সরকারি কাগজপত্রে এর নাম ছিল 'নারায়ণপুর এরোড্রাম'। বর্তমানে এই বিমানঘাটির নাম পরিবর্তন করে করা হয়েছে 'মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট'। বিমান-বাহিনীর সামরিক ঘাটি হওয়ার জন্য প্রথমে এখানে সামরিক বিমানই উঠা-নামা করত। ১৯৪২ সালের ১ অক্টোবর সরকারি আদেশে ঘাটিটি সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষিত হয়। পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার বিলোনিয়া, খোয়াই, কমলপুর ও কৈলাসহরে বিমানঘাটি স্থাপিত হয়েছিল।

ত্রিপুরায় প্রথম বেসামরিক বিমান পরিষেবা চালু হয়েছিল ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে। প্রথমে আগরতলা-কলকাতা রুটে বিমান চলাচল করত। এই রুটে প্রথমদিকে দুটি বিমানসংস্থা পরিষেবা প্রদান করত— কলিঙ্গ এয়ারলাইন্স ও স্কাইওয়েজ হো। আগরতলা-কলকাতা রুটের ভাড়া প্রথমে ছিল ৩০ টাকা থেকে ৩৫ টাকা। বিমানগুলি ছিল 'ডাকোটা'— ২০/২১ আসন বিশিষ্ট এবং বসার ব্যবস্থা ছিল সাধারণ বেঞ্চের মতো। যাত্রী বহন করলেও এই বিমানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মাল পরিবহন। পরবর্তী সময়ে এর ভাড়া বাড়িয়ে করা হয় ৪০ টাকা। কয়েক মাসের মধ্যেই বিড়লার 'ভারত এয়ারওয়েজ' আগরতলা-কলকাতা রুটে বিমান পরিষেবা চালু করে। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে 'ভারত এয়ারওয়েজ' বিমান পরিষেবা চালু করেই একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে আগের দুটি বিমান সংস্থা পরিষেবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। 'ভারত এয়ারওয়েজ' প্রথমে ভাড়া ধার্য করে ৫০ টাকা। অনেক আবেদন নিবেদনের পর এক টাকা কমিয়ে ভাড়া করা হয় ৪৯ টাকা। 'ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন' গঠিত হওয়ার পর 'ভারত এয়ারওয়েজ' উঠে যায়। ফলে আগরতলা-কলকাতা রুটে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স পরিষেবা শুরু করে। ১৯৫৩ সালের ২৯ অক্টোবর চার টাকা কমিয়ে ৪৫ টাকা ভাড়া করা হয়। এর পরে বছরে দু-তিনবার করে ভাড়া বাড়তে থাকে। আগরতলা-কলকাতা রুটের প্রথম বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি ছিল ভারত এয়ারওয়েজের পাটবাহী স্কাই মাস্টার। বাংলাদেশের কসবা থানার ঈশাননগর গ্রামের কাছে বিমানটি ভেঙে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় সাতজন বিমানকর্মী নিহত হন এবং অনেক গ্রামবাসী আহত হন। বহু বছর বাদে ২০১৫ সালে Airport Authority of India (AAI) আগরতলা এয়ারপোর্টকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার কাজ শুরু করেছে। এই কাজের জন্য AAI পাঁচশ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। এই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ২০১৯-২০ সাল।

রাজন্য আমলে ত্রিপুরায় রেল পরিষেবা চালু হয়নি। যদিও রেলপথ নির্মাণের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। মহারাজা বীরবিক্রম রাজ্যভার গ্রহণ করে আভ্যন্তরীণ যাতায়াতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। Martin & Co.-এর সাহায্যে কমলাসাগর থেকে উদয়পুর এবং কমলাসাগর থেকে বীরেন্দ্রনগর (জিরানিয়া)— এই দুটি রেলপথ স্থাপনে সচেষ্ট হন তিনি। ১৯২৯ সালে এই প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেলেও শেষপর্যন্ত তা সাফল্যলাভ করেনি। এই ব্যর্থতার কোনো কারণ জানা যায় না।

ত্রিপুরা ভারতের রেলমানচিত্রে প্রথম যুক্ত হয় ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৪ সালের ২২ এপ্রিল ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ধর্মনগর রেলস্টেশনে কলকলিঘাট থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত রেলপথের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই রেলপথ পরে কুমারঘাট পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ২২ এপ্রিল আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও ১ এপ্রিল থেকেই রেল চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই রেলপথটির দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে উনিশ মাইল। এর মধ্যে আসাম অঞ্চলে বারো মাইল, আর ত্রিপুরায় সাড়ে সাত মাইল। ত্রিপুরায় সেইসময় তিনটি রেলস্টেশন ছিল— চোরাইবাড়ি, নদীয়াপুর ও ধর্মনগর। ওই সাড়ে উনিশ মাইল রেলপথ তৈরি করতে মোট ব্যয় হয়েছিল দুই কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা। ভারতীয় রেলবোর্ড সেই টাকা দিয়েছিল। রেলপথের কাজ শুরু হয় ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে এবং শেষ হয় ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। রেলপথটি মিটারগেজ লাইনের মান অনুযায়ী তৈরি হয়েছিল। মিটারগেজ লাইনে রেল

চলাচলের দীর্ঘ বাহান্ন বছর পরে ত্রিপুরা ভারতের ব্রডগেজ রেলওয়ের মানচিত্রে প্রবেশ করে ২০১৬ সালের ৩১ জুলাই। রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু আগরতলা থেকে নিউ দিল্লি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য 'ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস'-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

ত্রিপুরায় ব্রডগেজ রেলপথে ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, রাজধানী এক্সপ্রেস, দেওঘর এক্সপ্রেস, হামসফর এক্সপ্রেস ও কয়েকটি লোকাল ট্রেন চালু হলেও পার্বত্য ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো সুগম নয়। এর প্রধান কারণ এই প্রান্তিক রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান। বর্তমানে ত্রিপুরার নদীগুলি নাব্যতা হারিয়েছে। সড়কপথ, রেলপথ ও আকাশপথই ত্রিপুরায় যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম। ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের বাস পরিষেবা চালু আছে। ২০০১ সালের ১১ জুলাই আগরতলা থেকে ঢাকা বাস পরিষেবা চালু হয়। আগরতলা থেকে ভায়া ঢাকা হয়ে কলকাতা পর্যন্ত বাস পরিষেবা চালু হয় ২০১৫ সালের ২ জুন। এর ফলে দূরত্ব ১৬৫০ কিলোমিটার (ভায়া গুয়াহাটি) থেকে কমে ৫০০ কিলোমিটার হয়েছে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে রেল পরিষেবা চালু করে দিল্লির সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ত্রিপুরাকে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার করিডোর বানানোর ভারত সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ত্রিপুরার গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যাবে।

তথ্যসূত্র :

১। দীনেশ চন্দ্র সাহা, 'বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরা' (১ম খন্ড- রাজন্য যুগ), বইমেলা ২০০৭, পৃষ্ঠা ১১৬
২। জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল, 'ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত', নভেম্বর ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৪
৩। বিভাস কিলকিদার, 'ত্রিপুরা : সেকাল—একাল', জানুয়ারি ১৯৮০ পৃষ্ঠা ৩১

সহায়ক গ্রন্থ :

১। অচ্যুতচরণ চৌধুরী : 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (পূর্বাংশ), বইওয়ালা, কলকাতা- ৪৮, নভেম্বর ২০০০
২। জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল : 'ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত' প্রকাশক- জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল, আগরতলা, ত্রিপুরা, নভেম্বর ১৯৯২
৩। ত্রিপুর চন্দ্র সেন(সম্পা.) : 'ত্রিপুরা দেশের কথা (১৬২৬-১৭১৫ খ্রী.)', প্রকাশক- ত্রিপুর চন্দ্র সেন, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৯৬৫
৪। দীনেশ চন্দ্র সাহা : 'বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরা' (১ম খন্ড- রাজন্য যুগ), রাইটার্স পাবলিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, বইমেলা ২০০৭
৫। দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.): 'রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা', শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, ১৯৭৬
৬। বিভাস কিলকিদার : 'ত্রিপুরা : সেকাল—একাল', ওরিয়েন্ট বুক সোসাইটি, আগরতলা, ত্রিপুরা, জানুয়ারি ১৯৮০
৭। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত : 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর', শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, ১৯৭৬
৮। রনজিৎ পাল: 'ত্রিপুরার শ্রমিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাস' (১ম খন্ড), রানার প্রকাশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, জানুয়ারি ১৯৮৪
৯। সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.): 'ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন (১৯০৩-১৯৪৯), শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, ১৯৭১
১০। Tripur Chandra Sen : 'Tripura In Transition : 1923-1957 A.D.', India, 1970